জুন ২০১৮
৭ম পর্ব । ২য় সংখ্যা

ইনফো

স্বাস্থ্য সাময়িকী

সূচী

রোগের ইতিকথা	২
মানবদেহ	৩
ছবি দেখে রোগ নির্ণয়	৫
বিশেষ প্রবন্ধ	৬
জীবাণু পরিচিতি	৯
রোগ ও চিকিৎসা	১০
চিকিৎসা পদ্ধতি	১২
স্বাস্থ্যকথা	১৪
ইনফো কুইজ	১৫

সম্পাদক মন্ডলী

এম. মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন
ডাঃ আদনান রহমান
ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী
ডাঃ মোঃ ইসলামুল হক
ডাঃ ফাহিমা জাহান ইশানা
ডাঃ কে. এম. তৌফিকুল ইসলাম
ডাঃ মেহনাজ রশীদ মোহনা
ডাঃ মোঃ রাকিবুল হাসান
ডাঃ সাইকা বুশরা

ডিজাইন

ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড-১২৩, বাড়ী-১৮এ
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

জলাতঙ্ক

আজ থেকে প্রায় ৪০০০ বছর আগে জলাতঙ্ক বা র‍্যাবিস রোগটির আবির্ভাব ঘটে। সাধারণত র‍্যাবডো ভাইরাস গ্রুপের অন্তর্গত র‍্যাবিস ভাইরাস বহনকারী কোন প্রাণী মানুষকে কামড়ালে এই রোগটি হয়ে থাকে। ১৬ শতকে ইতালীয় চিকিৎসক গিরোলামো ফ্রাকাস্তোরো জলাতঙ্ককে একটি মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করেন। ল্যাটিন শব্দ 'To rage' (তর্জন গর্জন করা) থেকে র‍্যাবিস রোগের নামকরণ করা হয়। বাংলায় একে বলা হয়ে থাকে জলাতঙ্ক, কারণ এই রোগে আক্রান্ত রোগী পানি বা তরল গিলতে গিয়ে গলায় প্রচন্ড ব্যাথা ও চাপ অনুভব করে, যা তার মাঝে পানি বা তরল খাবারের প্রতি ভীতি সৃষ্টি করে। ফরাসি অণুজীববিদ লুইস পাস্তুর ৫ বছর গবেষণার পর ১৮৮৫ সালে র‍্যাবিস ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করেন। সে সময় জোসেফ মেইস্তার নামের একজন ৯ বছরের বালককে একটি র‍্যাবিস ভাইরাস বহনকারী কুকুর কামড় দেয়। তখন লুইস পাস্তুর প্রথম এই ভ্যাক্সিন জোসেফের উপর প্রয়োগ করেন এবং সফলতা লাভ করেন।

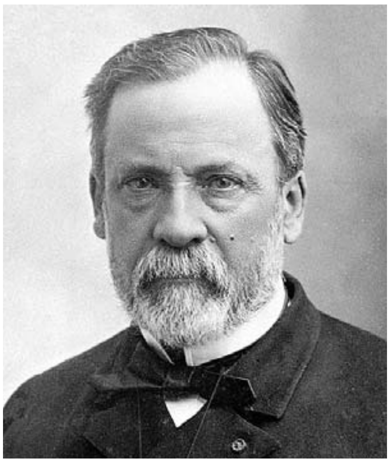

লুইস পাস্তুর (১৮২২ - ১৮৯৫)

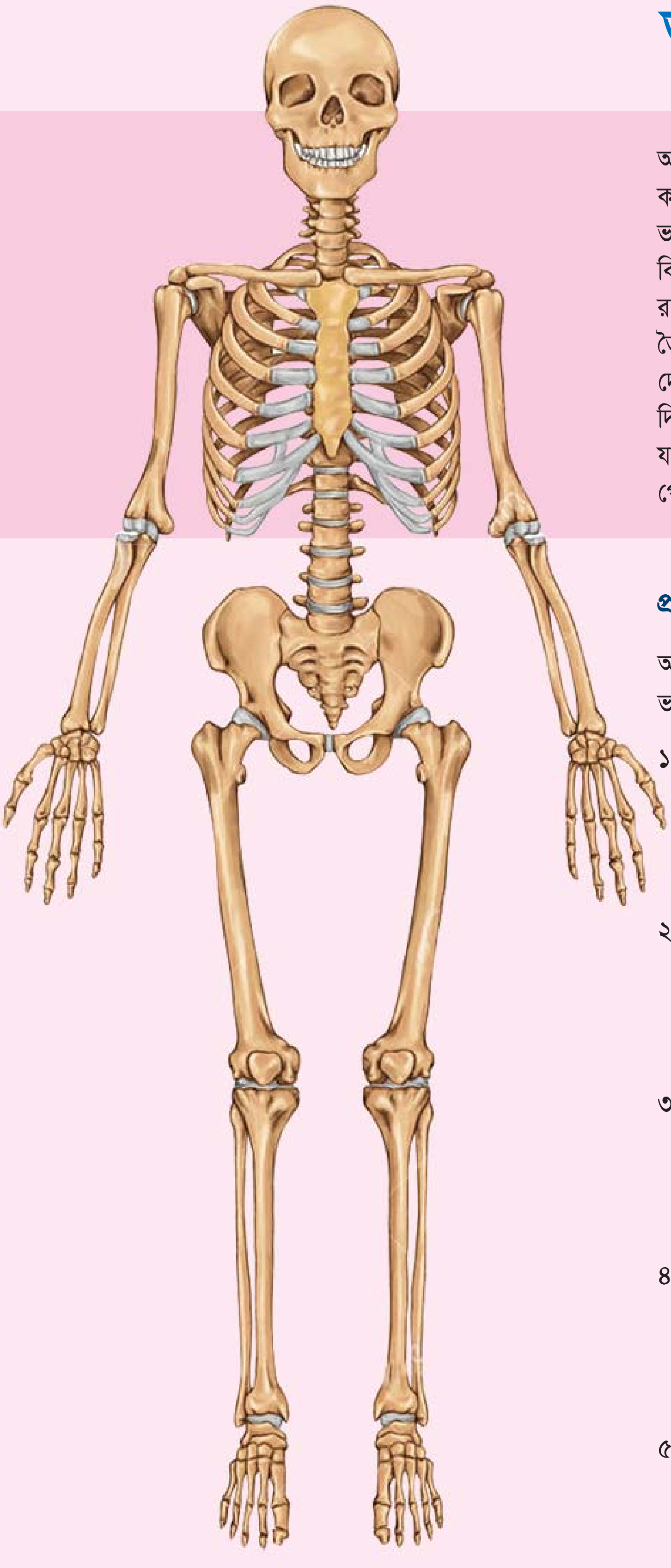

অস্থিতন্ত্র (Skeletal System)

অস্থি বা হাড় আমাদের দেহের মূল কাঠামো তৈরি করে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহায়তা করে। যেমন- আমাদের মেরুদন্ড ও পায়ের অস্থিসমূহ শরীরের ভার বহন করে ও চলাফেরা করতে সাহায্য করে। কিছু কিছু অস্থি আমাদের বিশেষ সংবেদনশীল অঙ্গকে সুরক্ষা করে, যেমন- আমাদের মাথার খুলি মস্তিষ্ককে রক্ষা করে, তেমনি আমাদের বুকের বেশ কিছু অস্থি এক সঙ্গে মিলে বক্ষপিঞ্জর তৈরি করে যা হৃদপিন্ড, ফুসফুস ও যকৃতকে রক্ষা করে। এছাড়াও অস্থি আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জমা রাখে। অস্থি জীবন্ত কোষ দিয়ে তৈরি এবং তার প্রমাণ হলো ভাঙ্গা অস্থি সঠিক চিকিৎসায় জোড়া লেগে যায়। অন্যান্য অঙ্গের মত অস্থিতেও রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে খাদ্য ও অক্সিজেন পৌঁছায় এবং বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ বের হয়ে যায়।

প্রকারভেদ

আকার ও আকৃতির উপর ভিত্তি করে আমাদের দেহের অস্থিগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন-

১. লম্বা অস্থি (Long Bone)ঃ এই ধরণের অস্থি দেখতে নলাকার এবং এদের উচ্চতা প্রস্থের তুলনায় বেশী। আমাদের দেহের অধিকাংশ ভার এই অস্থিগুলো বহন করে, যেমন- বাহুর অস্থি হিউমেরাস (Humerus), উরুর অস্থি ফিমার (Femur)

২. ছোট অস্থি (Short Bone)ঃ এই ধরণের অস্থি দেখতে ঘনাকার এবং এদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ত প্রায় সমান। এই অস্থিগুলো আমাদের দেহের কিছু ভার বহন করে। যেমন- হাতের আঙ্গুলের অস্থি কারপাল (Carpal), পায়ের আঙ্গুলের অস্থি টারসাল (Tarsal) এবং কানের অস্থি স্টেপিস (Stapes)

৩. চ্যাপ্টা অস্থি (Flat Bone)ঃ এই ধরণের অস্থি দেখতে পাতলা ও বাঁকানো। মাংসপেশীগুলো এই অস্থিগুলোতে এসে সংযুক্ত হয় এবং এই অস্থিগুলো আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহকে সুরক্ষা করে। যেমন- বক্ষ পিঞ্জরের মাঝের অস্থি স্টারনাম (Sternum)

৪. অসমান অস্থি (Irregular Bone)ঃ এই ধরণের অস্থি দেখতে জটিল ধরণের। এদের নির্দিষ্ট কোন আকৃতি নেই। এই অস্থিগুলো আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহকে সুরক্ষা করে। যেমন- মেরুদন্ডের অস্থি কশেরুকা (Vertebrae)

৫. সিসাময়েড অস্থি (Sesamoid Bone)ঃ এই ধরণের অস্থি দেখতে ছোট এবং গোলাকার। এদের উৎপত্তি টেন্ডন থেকে। যেমন- হাঁটুর অস্থি প্যাটেলা (Patella)

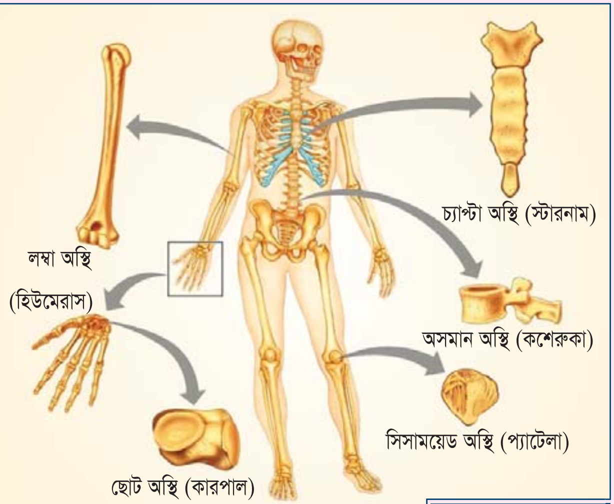

অস্থির প্রকারভেদ

গঠন

অস্থি হলো এক ধরণের কঠিন যোজক কলা (Connective Tissue)। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে মোট অস্থির সংখ্যা ২০৬ টি। শরীরের সবচেয়ে বড় অস্থির নাম হলো ফিমার এবং সবচেয়ে ছোট অস্থির নাম হলো স্টেপিস। অস্থির বাহিরের অংশটি শক্ত এবং ভিতরের মাঝখানের অংশটি ফাঁপা। এই ফাঁপা অংশের মধ্যে নরম একটি উপাদান থাকে যাকে অস্থিমজ্জা বলে। অস্থিমজ্জা থেকে তৈরি হয় লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা। অস্থি কিছু বিশেষ ধরণের কোষ এবং ম্যাট্রিক্স এর সমন্বয়ে গঠিত।

অস্থির কোষ

অস্থি যে কোষগুলো দিয়ে তৈরি সেগুলো হচ্ছে-

- অসটিওজেনিক কোষ (Osteogenic Cell)
- অসটিওসাইট (Osteocyte)
- অসটিওব্লাস্ট (Osteoblast)
- অসটিওক্লাস্ট (Osteoclast)

অস্থির কোষ

অস্থির ম্যাট্রিক্স

অস্থির ম্যাট্রিক্স জৈব (Organic) ও অজৈব (Inorganic) এই দুই ধরণের উপাদান দিয়ে গঠিত।

- জৈব উপাদান এর মধ্যে রয়েছে-
  - কোলাজেন তন্তু (Collagen Fibers)
- অজৈব উপাদান এর মধ্যে রয়েছে-
  - ক্যালসিয়াম (Calcium)
  - ফসফরাস (Phosphorus)
  - বাই কার্বোনেট (Bicarbonate)
  - ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium)
  - সোডিয়াম (Sodium)
  - পটাশিয়াম (Potassium)

অস্থিসন্ধি (Joint)

দুই বা ততোধিক অস্থি কোন স্থানে মিলিত হলে তাকে অস্থিসন্ধি (Joint) বলে। এখানে অস্থিগুলো সাধারণত অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট, টেন্ডন ইত্যাদির মাধ্যমে একটির সাথে অন্যটি লাগানো থাকে। এর মাধ্যমে আমরা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহকে নাড়াতে পারি। নিচে কয়েকটি বড় অস্থিসন্ধির নাম দেয়া হলো-

- স্কন্ধসন্ধি (Shoulder Joint)
- কনুইসন্ধি (Elbow Joint)
- কব্জিসন্ধি (Wrist Joint)
- জঙ্ঘাসন্ধি (Hip Joint)
- হাঁটুসন্ধি (Knee Joint)
- গোড়ালীসন্ধি (Ankle Joint)

অস্থিবন্ধনী (Ligament)

অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট হলো এমন একটি যোজক কলা (Connective Tissue) যেটি একটি অস্থিকে আরেকটি অস্থির সাথে আটকে রাখতে সাহায্য করে। লিগামেন্টগুলো সাধারণত অস্থির প্রান্তদেশে থাকে এবং এক অস্থির সাথে আরেক অস্থির সংযোগ স্থাপন করে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ছবি দেখে রোগ নির্ণয়

কানপাকা

আমাদের কানের তিনটি অংশ আছে বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তকর্ণ। মধ্যকর্ণের প্রদাহকে কানপাকা রোগ (Otitis Media) বলে। কান দিয়ে পুঁজ পড়া ও কানে কম শোনা হলো এই রোগের প্রধান উপসর্গ। কানপাকা রোগ দুই ধরণের হয়ে থাকে। একটি হলো সাধারণ বা নিরাপদ কানপাকা রোগ, এক্ষেত্রে সাধারণত দুর্গন্ধবিহীন, পাতলা পুঁজ কান থেকে বের হয়। অন্যটি হলো অনিরাপদ কানপাকা রোগ, যা ঝুঁকিপূর্ণ জটিলতা তৈরি করতে পারে। এক্ষেত্রে কান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত ও ঘন পুঁজ বের হয়।

অ্যাপথাস স্টোমাটাইটিস

অ্যাপথা বলতে বোঝায় ঘা বা আলসার। স্টোমাটাইটিস অর্থ মুখের ভেতরের আবরণ বা মিউকাস লাইনিং এর প্রদাহ। অ্যাপথাস স্টোমাটাইটিস প্রকৃতপক্ষে অ্যাপথাস আলসার নামেই বেশি পরিচিত। এটি দেখতে গোলাকার বা ডিম্বাকার। এর কেন্দ্র সাদা বা হলুদাভ হয় এবং চারদিকে লাল রেখার মত থাকে। এটি সাধারণত জিহ্বা, ঠোঁট ও চিবুকের ভেতরের দিকে ও মাঁড়িতে হয়। মানসিক চাপ, অতিরিক্ত ঝাল বা মসলাদার খাদ্য, আঘাত, ফুড এলার্জি ও বংশগত কারণ অ্যাপথাস আলসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

সোরিয়াসিস

সোরিয়াসিস ত্বকের একটি প্রদাহজনিত রোগ। যেকোন বয়সে এই রোগ হতে পারে। মানুষের ত্বকের কোষ প্রতিনিয়ত মরে যায় এবং নতুন করে তৈরি হয়। সোরিয়াসিসে ত্বকের কোষ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে মলিন রূপালী আঁশযুক্ত ছোপ দেখা দেয় এবং এই ছোপগুলো উঠে যাবার পর লালচে আভা দেখা যায়। সোরিয়াসিস ত্বকে ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও হতে পারে, যেমন- কনুই, হাঁটু, মাথা, হাত ও পায়ের নখ। এটি সংক্রামক রোগ নয়, কাজেই সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায় না।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

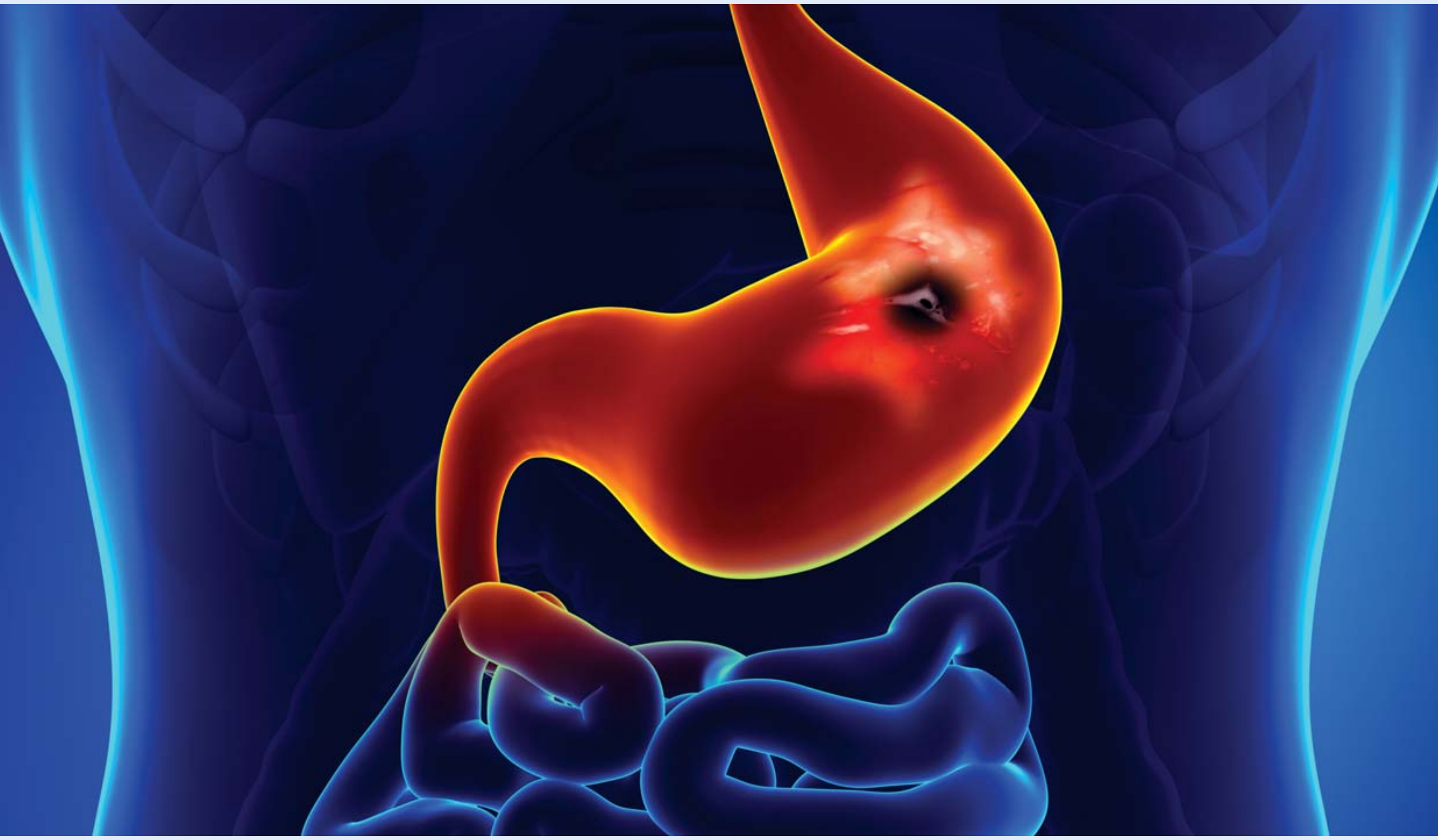

পেপটিক আলসার ডিজিজ্

পেপটিক আলসার ডিজিজ্ নামটির সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। আমরা যে খাবার খাই, তার বেশিরভাগ অংশ পরিপাক হয় পাকস্থলীতে। পাকস্থলীতে কতগুলো বিশেষ ধরণের কোষ রয়েছে যা হতে বিভিন্ন এনজাইম ও অম্ল বা এসিড নিঃসৃত হয়ে থাকে। খাদ্য পরিপাকের জন্য এদের অবদান অপরিসীম। পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত এই হাইড্রোক্লোরিক এসিড এবং পেপসিন এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে পরিপাকতন্ত্রের কোনো স্থানে ক্ষত বা ঘা সৃষ্টি হলে তাকে পেপটিক আলসার ডিজিজ্ বলে। পরিপাকের প্রয়োজনে পাকস্থলী শক্তিশালী হাইড্রোক্লোরিক এসিড এবং পেপসিন এনজাইম নিঃসরণ করে। এই হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্বারা পাকস্থলীর নিজের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেজন্য পাকস্থলীর মিউকাস আবরণটির একটি নিজস্ব প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা রয়েছে। একে গ্যাস্ট্রিক মিউকোসাল ব্যারিয়ার বলা হয়ে থাকে। পাকস্থলীর মিউকাস সেল হতে নিঃসৃত মিউকাস এবং প্রোস্টাগ্লেন্ডিন নামক হরমোন মিলে এই ব্যারিয়ার বা প্রতিরক্ষামূলক আবরণ তৈরি করে থাকে। এটি থাকার কারণে, হাইড্রোক্লোরিক এসিড পরিপাকতন্ত্রের সরাসরি কোনও ক্ষতি করতে পারে না। মিউকাস আবরণ এবং প্রোস্টাগ্লেন্ডিন এর দ্বারা গঠিত এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যদি কোন কারণে ভেঙ্গে যায় তাহলে পাকস্থলী নিজের তৈরি এই হাইড্রোক্লোরিক এসিড এবং পেপসিন এনজাইম দ্বারা নিজের অথবা পরিপাকতন্ত্রের যেকোন স্থানে ক্ষত বা ঘা সৃষ্টি করে। দীর্ঘ সময় ধরে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে একসময় এই ক্ষত গভীর হয়ে তা পাকস্থলীর সবকটি স্তরকে আক্রান্ত করে ফেলে, এমনকি ফুটোও করে ফেলতে পারে। সাধারণত চিকিৎসার মাধ্যমে পেপটিক আলসার ডিজিজ্ সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব। তবে এই রোগ দীর্ঘ সময় ধরে থাকলে তা তীব্র আকার ধারণ করতে পারে এবং বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

যেসব স্থানে পেপটিক আলসার ডিজিজ্ হয়

পেপটিক আলসার ডিজিজ্ যে শুধু পাকস্থলীতে হয় তা নয়, এটা পরিপাকতন্ত্রের যেকোন অংশে হতে পারে। সাধারণত পরিপাকতন্ত্রের যে অংশে পেপটিক আলসার ডিজিজ্ হয় সেগুলো হচ্ছে-

- খাদ্যনালী বা ইসোফেগাসের নিচের প্রান্ত
- পাকস্থলী বা স্টোমাক
- ক্ষুদ্রান্ত্র বা ডিওডেনামের প্রথম অংশ
- পরিপাকতন্ত্রের অপারেশনের পর যে অংশে জোড়া লাগানো হয় সে অংশে

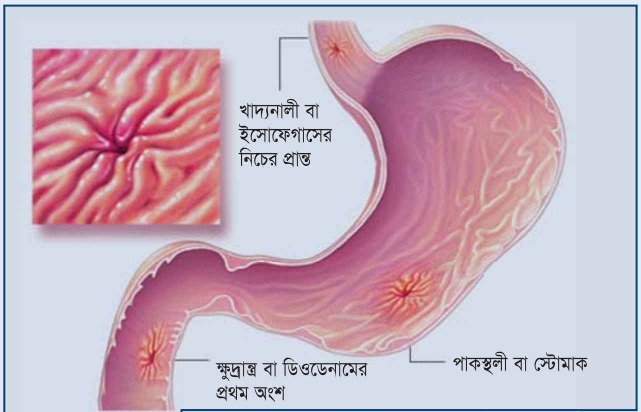

পেপটিক আলসার ডিজিজ্ হওয়ার স্থানসমূহ

কারণ

যে সব কারণে পেপটিক আলসার ডিজিজ্ হয় তা নিচে দেয়া হলো-

- হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি *(Helicobacter pylori)* নামক ব্যাকটেরিয়া
- ঘন ঘন ব্যথানাশক ওষুধ সেবন (NSAIDs)
- ধূমপান
- অনিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিত খাবার গ্রহণ
- মদ্যপান
- অতিরিক্ত চা ও কফি পান
- অতিরিক্ত মসলা যুক্ত খাবার
- মানসিক চাপ
- দীর্ঘ দিন ধরে স্টেরয়েড সেবন
- জোলিনজার এলিসন সিন্ড্রোম
- জেনেটিক কারণ

হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি

লক্ষণ

পেপটিক আলসার হলে রোগীর সাধারণত নিচের লক্ষণসমূহ দেখা দেয়-

- বুক ও পেটের উপরের অংশে ব্যথা অনুভব করা (পাকস্থলীর আলসারের ক্ষেত্রে খাবার খেলে এ ব্যথা বেড়ে যায়, কিন্তু ক্ষুদ্রান্ত্রে আলসারের ক্ষেত্রে খাবার খেলে এ ব্যথা সাধারণত কমে যায়)
- বুক জ্বালাপোড়া করা
- বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া
- খাবারে অরুচি ও ক্ষুধামন্দা হওয়া

ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস

উপরের লক্ষণগুলো অন্যান্য যে সকল রোগের লক্ষণের সাথে মিল পাওয়া যায় তা নিচে দেয়া হলো-

- প্যানক্রিয়াটাইটিস (Pancreatitis)
- কোলেসিস্টাইটিস (Cholecystitis)
- এপেন্ডিসাইটিস (Appendicitis)
- পাকস্থলীর ক্যান্সার (Gastric Cancer)
- মায়োকারডিয়াল ইনফারক্শন (Myocardial Infarction)

পরীক্ষা

বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে পেপটিক আলসার সনাক্ত করা যায়। পরীক্ষাগুলো নিচে দেয়া হলো-

- এন্ডোস্কোপি (Endoscopy)- এটি সবচাইতে নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা, ফাইবার অপটিক গ্লাসের তৈরি বিশেষ নলের সাহায্যে পাকস্থলী বা ডিওডেনামের অংশগুলো সরাসরি দেখে রোগ নির্ণয় করা হয়
- পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাম (Ultrasonogram)

- হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি (*Helicobacter pylori*) নামক ব্যাকটেরিয়া সনাক্ত করার জন্য নিচের পরীক্ষাগুলো করা হয়ে থাকে-
  - সেরোলোজী (Serology)
  - ১৩সি-ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট (13_C-Urea Breath Test)
  - ফিকাল এন্টিজেন টেস্ট (Fecal Antigen Test)
  - হিস্টোলোজি (Histology)
  - র‍্যাপিড ইউরিয়েজ টেস্ট (Rapid Urease Test)
  - মাইক্রোবায়োলোজিক্যাল কালচার (Microbiological Culture)

চিকিৎসা

পেপটিক আলসারে আক্রান্ত রোগীদের ব্যথা ও আলসার কমানোর জন্য যে ওষুধ দেয়া হয় তা নিচে দেয়া হলো-

- এন্টাসিড
- রেনিটিডিন, ফেমোটিডিন
- প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর- ওমিপ্রাজল, র‍্যাবিপ্রাজল, ইসোমিপ্রাজল, প্যান্টোপ্রাজল ও লেনসোপ্রাজল

জীবাণুজনিত (*Helicobacter pylori*) কারণে যদি এ রোগ হয়ে থাকে তবে বিভিন্ন ওষুধের সমন্বয়ে চিকিৎসা দেয়া হয় যা ট্রিপল থেরাপি নামে পরিচিত। এই চিকিৎসা ৭ দিন দেয়া হয় তবে অবস্থাভেদে এর সময়কাল ১০ থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এতে যে সকল ওষুধ দেয়া হয় তা নিচে দেয়া হলো-

- ওমিপ্রাজল অথবা অন্যান্য প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর ১ টি
- অ্যান্টিবায়োটিক (যে কোন ২ টি)
  - ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন
  - এমোক্সিসিলিন
  - মেট্রোনিডাজোল

জটিলতা

পেপটিক আলসার দীর্ঘস্থায়ী হলে বা সুচিকিৎসা করা না হলে নানা ধরণের জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেসব জটিলতা দেখা দেয় তা নিচে দেয়া হলো-

- পারফোরেশন (Perforation)
- ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ (Bleeding)
- রক্তবমি (Hemoptysis)
- পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া (Melena)
- রক্তশূণ্যতা (Anemia)
- গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন (Gastric Outlet Obstruction)

প্রতিরোধ

জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনে সহজেই এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। পেপটিক আলসার ডিজিজে আক্রান্ত রোগীদের অবশ্যই ধূমপান ও ঘন ঘন ব্যথানাশক ওষুধ সেবন থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতে হবে এবং নিয়মিত খাবার খেতে হবে।

জীবনযাত্রা পরিবর্তন

- ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে হবে
- ব্যথার ওষুধ যথাসম্ভব উপেক্ষা করতে হবে
- মানসিক চাপ মুক্ত থাকতে হবে
- ঘুমাতে যাওয়ার ২ ঘন্টা আগে থেকে কিছু খাওয়া যাবে না

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন

- যেসব খাবারে (অতিরিক্ত ঝাল ও মশলাযুক্ত খাবার, ভাজাপোড়া ও তেল জাতীয় খাবার) বুক জ্বালা পোড়া বা পেপটিক আলসার ডিজিজের ব্যথা বাড়ে সেসব খাবার কম খেতে হবে অথবা খাওয়া বন্ধ রাখতে হবে
- প্রতিবেলার সময়মত খাবার খেতে হবে
- দিনে ৩ বেলা বেশী পরিমাণে খাবার না খেয়ে অল্প অল্প করে ৫ থেকে ৬ বার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে
- বেশী মসলাযুক্ত খাবার পরিহার করতে হবে
- খাবার ধীরে ধীরে ভালমতো চিবিয়ে খেতে হবে
- চা, কফি, কোমল পানীয় ইত্যাদি যতটুকু সম্ভব কম গ্রহণ করতে হবে
- প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার বেশী খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে
- প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে

তথ্যসূত্রঃ
১. *Davidson's Principal and Practice of Medicine; 23rd Edition*
২. *ইন্টারনেট*

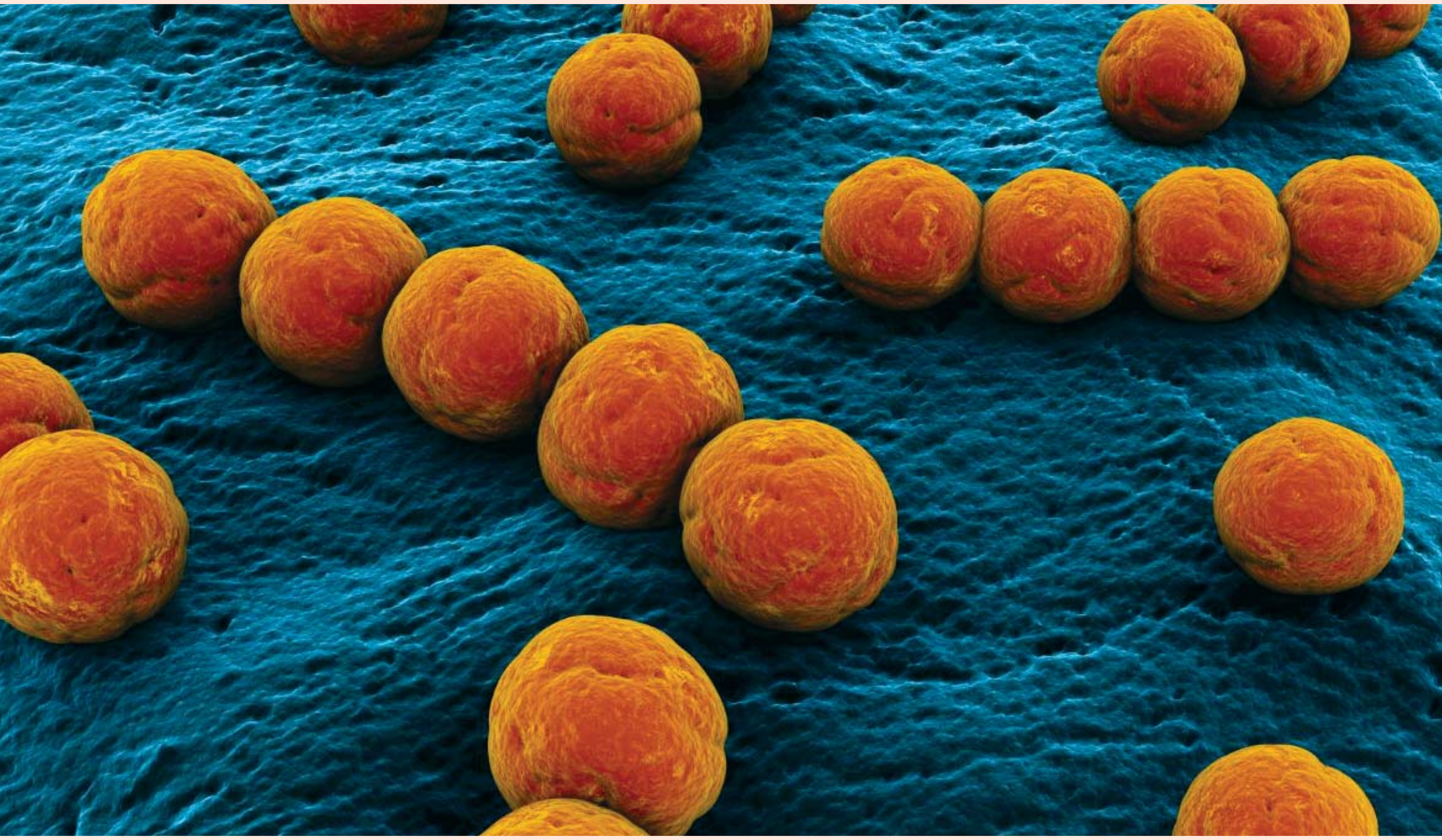

স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেনস্ *(Streptococcus pyogenes)*

বৈশিষ্ট্য

- স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেনস্ এক ধরণের গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া
- এটি গোলাকার এবং এদের বেশির ভাগেরই ক্যাপসুল (Capsule) ও পিলাই (Pili) থাকে
- এটি টক্সিন, এনজাইম ও অ্যান্টিজেন তৈরির মাধ্যমে মানবদেহে বিভিন্ন ধরণের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে

যে সকল রোগ করে

- টনসিল - টনসিলাইটিস, পেরিটনসিলার অ্যাবসেস্
- ফ্যারিংক্স - ফ্যারিনজাইটিস
- সাইনাস - সাইনুসাইটিস
- কান - অটাইটিস মিডিয়া
- মস্তিষ্ক - ব্রেইন অ্যাবসেস্
- রক্ত - সেপটিসেমিয়া, ব্যাকটেরেমিয়া, পায়েমিয়া
- অটো ইমিউন - অ্যাকিউট গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস
- ত্বক- ইমপেটিগো, সেলুলাইটিস
- লসিকাতন্ত্র- লিম্ফেনজাইটিস, লিম্ফ অ্যাডিনাইটিস
- হৃদপিন্ড- অ্যাকিউট ইনফেক্টিভ এন্ডোকারডাইটিস

চিকিৎসা

উল্লেখিত রোগের কারণে যে সকল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয় তা নিচে দেওয়া হলো-

- সেফালোস্পোরিন (Cephalosporin)
- এজিথ্রোমাইসিন (Azithromycin)
- এমক্সিসিলিন (Amoxicillin)
- ক্লিন্ডামাইসিন (Clindamycin)
- ইরাইথ্রোমাইসিন (Erythromycin)
- ভ্যানকোমাইসিন (Vancomycin)
- ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন (Clarithromycin)

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

জলবসন্ত

জলবসন্ত বা চিকেনপক্স একটি সংক্রামক রোগ যা ভ্যারিসেলা জোস্টার নামক এক ধরণের ভাইরাসের আক্রমণে হয়ে থাকে। এই রোগ নারী ও পুরুষ যে কারো হতে পারে। তবে শিশুদের অর্থাৎ ১০ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। জলবসন্ত একবার হলে দেহে এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় ফলে এই রোগের জীবাণু শরীরে আর আক্রমণ করতে পারে না। তাই কেউ একবার এই রোগে আক্রান্ত হলে সাধারণত দ্বিতীয়বার তার আর এই রোগ হয় না।

যেভাবে এ রোগ ছড়ায়

জলবসন্ত অতিমাত্রায় ছোঁয়াচে রোগ হওয়ায় এটি খুব সহজেই একজন থেকে অন্যজনে ছড়িয়ে পড়তে পারে, যেমন- আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এলে, আক্রান্ত রোগীর ব্যবহৃত জিনিস স্পর্শ করলে, আক্রান্ত রোগীর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এবং আক্রান্ত রোগীর হাঁচি ও কাশি থেকে এ রোগটি ছড়াতে পারে। ভ্যারিসেলা ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার ১৪ থেকে ২১ দিন পর ধীরে ধীরে জলবসন্ত রোগের উপসর্গ, যেমন- ফুসকুড়ি ও জ্বর দেখা দিতে শুরু করে, তাই আক্রান্ত রোগীর শরীরে ফুসকুড়ি ওঠার ৫ দিন আগে থেকে এবং ফুসকুড়ি শুকিয়ে যাওয়ার পরবর্তী ৬ দিন সময়ের মধ্যে কেউ সংস্পর্শে এলে তারও জলবসন্ত হতে পারে ।

ভ্যারিসেলা জোস্টার ভাইরাস

লক্ষণ

নিচে জলবসন্তের লক্ষণগুলো দেওয়া হলো-

- সাধারণত ভাইরাস শরীরে প্রবেশের ১১ থেকে ২২ দিন পর্যন্ত কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা যায় না। এ সময়ের মধ্যে ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। পরবর্তী সময়ে হঠাৎ করেই জ্বর দিয়ে জলবসন্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জ্বরের সাথে শরীরব্যথা, মাথাব্যথা, শরীরে ম্যাজম্যাজ ভাব ইত্যাদি থাকতে পারে
- জ্বর হওয়ার পরের দিন থেকে শরীরে বিশেষ করে বুকে ও পিঠে বিশেষ ধরণের ফুসকুড়ি উঠতে শুরু করে। পরবর্তীতে ফুসকুড়িগুলো বড় হয়ে এর কেন্দ্রে পানি জমে। এর আবরণ খুব পাতলা হওয়ায় অল্পতেই ফুসকুড়িগুলো ফেটে যেতে পারে
- এরপর শরীরের বাইরের দিকের অঙ্গসমূহে যেমন- হাত, পা, মুখ ও মাথার ত্বকে গুটি উঠতে শুরু করে, তবে হাত ও পায়ের তালুতে গুটি দেখা যায় না
- সাধারণত ফুসকুড়িগুলো বেশ চুলকায়। চুলকালে ফুসকুড়ি ফেটে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে এবং পরে স্থায়ীভাবে দাগ হয়ে যেতে পারে

ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস

উপরের লক্ষণগুলো অন্যান্য যে সকল রোগের লক্ষণের সাথে মিল পাওয়া যায় তা নিচে দেওয়া হলো-

- হাম বা মিসেলস্
- রুবেলা
- স্টিভেন জনসন্ সিনড্রোম
- হ্যান্ড-ফুট-মাউথ ডিজিজ্

চিকিৎসা

জলবসন্তে আক্রান্ত রোগী সাধারণত এমনিতেই ভালো হয়ে যায়, তারপরেও কিছু সতর্কতা রোগীর কষ্ট কমাতে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে অনেক কার্যকর হতে পারে। উপসর্গ কমানোই হচ্ছে এই রোগের প্রধান চিকিৎসা। জলবসন্ত হলে নিচের ব্যবস্থাগুলো নিতে হয়-

- অতিরিক্ত চুলকানি হলে অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ দিতে হবে
- জ্বর ও ব্যথা হলে প্যারাসিটামল ওষুধ দিতে হবে
- ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ দেখা দিলে ৫ থেকে ৭ দিন ফ্লুক্লক্সাসিলিন দিতে হবে
- ত্বকে সংক্রমণ হলে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ সেবনের পাশাপাশি ত্বকে ব্যবহারের জন্য অ্যান্টিসেপটিক মলম দিতে হবে
- যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের ক্ষেত্রে অ্যাসাইক্লোভির জাতীয় অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ দিতে হবে

পরিচর্যা

- বেশি করে পানি ও তরল জাতীয় খাবার দিতে হবে
- মুখে ক্ষত হলে নরম খাবার দিতে হবে এবং ঝাল, লবণ ও মসলাযুক্ত খাবার দেয়া যাবে না
- শিশুদের ক্ষেত্রে নিয়মিত নখ কেটে দিতে হবে
- রোগীর ত্বক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতিদিন রাতে শোবার সময় সারাদিনের পরা পোশাক পরিবর্তন করে নতুন পোশাক পরতে হবে এবং বিছানার চাদর পরিবর্তন করতে হবে
- রোগীকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে

টিকা

জলবসন্ত প্রতিরোধের জন্য টিকা দেওয়া যেতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে ১২ থেকে ১৫ মাস বয়সে ভ্যাকসিন এর প্রথম ডোজ ও ৪ থেকে ৬ বছর বয়সে দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে। অপরদিকে ১৩ বছরের বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে ৪ থেকে ৮ সপ্তাহের ব্যবধানে দুটি ডোজ দিতে হবে। কিন্তু গর্ভবতী মা এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই টিকা দেওয়া যাবে না।

জটিলতা

জলবসন্ত হলে নিচের জটিলতাসমূহ হতে পারে-

- ফুসকুড়ি থেকে রক্তক্ষরণ
- শিশুর জন্মগত ত্রুটি
- নিউমোনিয়া
- হেপাটাইটিস
- মস্তিস্কে প্রদাহ
- কিডনির প্রদাহ
- ত্বকের প্রদাহ
- অস্থিসন্ধির প্রদাহ

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

আম্বিলিকাল কর্ডের পরিচর্যায় হেক্সিকর্ড

২০১৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেট ৭.১% সংযোজন করে। বিশেষত আম্বিলিকাল কর্ডের সঠিক পরিচর্যার জন্য এ নতুন সংযোজনটি করা হয়। ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) আম্বিলিকাল কর্ডের যত্নে একটি নতুন নির্দেশনা দেয়। উচ্চ শিশুমৃত্যু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জন্মগত শিশুদের আম্বিলিকাল কর্ড কাটার পর প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেট লাগাতে হবে। আর নিম্ন শিশুমৃত্যু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে জন্মগত শিশুদের ক্ষেত্রে আম্বিলিকাল কর্ড পরিস্কার ও শুকনো রাখতে হবে। ২০১১ সালে দক্ষিণ এশিয়ার সর্বপ্রথম দেশ হিসেবে নেপাল আম্বিলিকাল কর্ডের পরিচর্যার জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেটের ব্যবহার শুরু করে। এর সফলতার প্রেক্ষিতে নেপাল সরকার ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেটকে নবজাতকের আম্বিলিকাল কর্ড পরিচর্যার একটি অপরিহার্য ওষুধ হিসেবে সংযোজন করে। পরবর্তীতে আফ্রিকা মহাদেশের সাব-সাহারা অঞ্চলে ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেটের ব্যবহার শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানেও আম্বিলিকাল কর্ডের পরিচর্যায় ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেটের প্রচলন শুরু হয়। আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ২০১৩ সালে ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেট ৭.১% প্রস্তুত করে এসিআই লিমিটেড যা বাজারে হেক্সিকর্ড নামে পরিচিত। বাংলাদেশে হেক্সিকর্ড-এর কার্যক্ষমতা নিয়ে প্রায় ৩৪০ জন শিশুর উপর এপ্রিল ২০১৩ থেকে জুলাই ২০১৪ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়- এর নিয়োন্যাটোলজি বিভাগ এবং অবস্ ও গাইনি বিভাগের চিকিৎসকরা একটি গবেষণা পরিচালনা করেন, যার ফলাফলে তাঁরা দেখেন হেক্সিকর্ড ব্যবহারকারি শিশুদের নাভিতে সংক্রমণের হার প্রায় শতভাগ কমে গেছে। একই ধরণের তথ্য মার্চ ২০১২ আন্তর্জাতিক জার্নাল “ল্যানসেট”-এও প্রকাশিত হয়। বর্তমানে শহরে ও গ্রামে নবজাতকের নাভির যত্নে হেক্সিকর্ড ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে ফলে নাভির সংক্রমণজনিত কারনে শিশু মৃত্যুহার অনেকাংশে কমে এসেছে।

আম্বিলিকাল কর্ড

একটি শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন মায়ের সাথে তার যোগাযোগ হয় আম্বিলিকাল কর্ডের মাধ্যমে। এটি মা এবং বাচ্চার মধ্যে যোগসূত্র

তৈরি করে। কর্ডটির মায়ের দিকের অংশটি লাগানো থাকে জরায়ুতে (গর্ভফুলে) এবং বাচ্চার অংশটি লাগানো থাকে বাচ্চার নাভিতে। এই পথে মায়ের কাছে থেকে বাচ্চা গর্ভকালীন সময়ে পুষ্টি ও অক্সিজেন পায় এবং বাচ্চার শরীর থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ মায়ের শরীরে যায়। এটি দেখতে সরু, প্যাচানো ও নলাকার এবং এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০-১০০ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ ১-১.৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। একটি পূর্ণ আম্বিলিকাল কর্ড এ ২টি ধমনী ও ১টি শিরা থাকে। এই রক্তনালীগুলো হোয়ারটোন্স জেলী নামক এক প্রতিরক্ষামূলক আবরণের ভেতরে থাকে। ধমনীপথে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত ও বর্জ্য পদার্থ বাচ্চার শরীর থেকে গর্ভফুল হয়ে মায়ের শরীরে যায় এবং শিরাপথে অক্সিজেন ও বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান মায়ের শরীর থেকে বাচ্চার শরীরে যায়।

আম্বিলিকাল কর্ড কাটার পদ্ধতি

- আম্বিলিকাল কর্ড কাটার আগে খুব ভাল করে পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে
- বাচ্চার নাভির চামড়া থেকে প্রায় ১০ সে. মি. উপরে সুতা দিয়ে প্রথম বাঁধনটি দিতে হবে অথবা ক্লাম্প করতে হবে। সুতা বা ক্লাম্পটি অবশ্যই পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত হতে হবে
- দ্বিতীয় বাঁধনটি অথবা ক্লাম্পটি নাভির চামড়া থেকে ৭ সে. মি. উপরে আটকাতে হবে
- এবার একটি পরিষ্কার ধারালো কাঁচি বা ব্লেড দিয়ে দুই বাঁধন বা ক্লাম্পের মাঝখানে কর্ডটি কেটে ফেলতে হবে। কাটার পর কর্ডের প্রায় ০.৫ ইঞ্চি অংশ বাচ্চার নাভির সাথে আটকে থাকবে। এই অবশিষ্ট অংশটুকু প্রায় ১০ দিন পর খসে পরে যায়

হেক্সিকর্ড ব্যবহার বিধি

হেক্সিকর্ড ব্যবহারের আগে ও পরে, বিশুদ্ধ খাবার পানি ও সাবান দিয়ে দুই হাত ভালোমতো ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। হাত ধুয়ে পরিষ্কার করার পর হাত মোছা যাবে না, হাত যেন ভিজে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

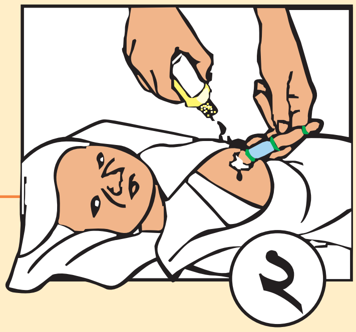

প্রথমে হেক্সিকর্ডের বোতলটি চেপে কিছু পরিমাণ হেক্সিকর্ড বের করে তা শিশুর নাভির চারপাশে লাগাতে হবে।

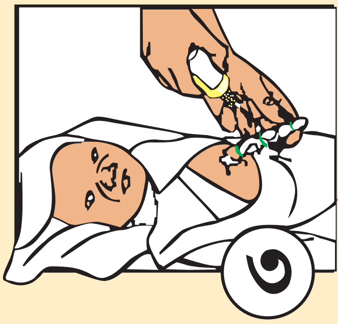

একইভাবে হেক্সিকর্ডের বোতলটি চেপে আরও কিছু পরিমাণ হেক্সিকর্ড বের করে তা নাভির কাটা অংশে লাগাতে হবে।

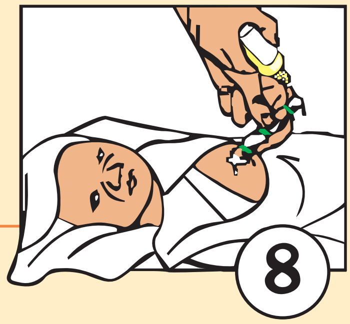

এবার আম্বিলিকাল কর্ডের প্রান্তভাগে এমনভাবে হেক্সিকর্ড ঢেলে দিতে হবে যেন পুরো কর্ডটি হেক্সিকর্ড দ্বারা ভিজে যায়। নাভিতে বা আম্বিলিকাল কর্ডে একবার হেক্সিকর্ড লাগানোর পর তা আর ধুয়ে ফেলা যাবেনা।

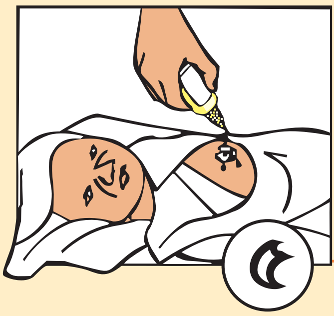

আম্বিলিকাল কর্ড খসে পরার পরও কিছুদিন শিশুর নাভিতে হেক্সিকর্ড লাগাতে হবে।

স্বাস্থ্যকথা

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে উপকারী ৬ খাবার

কলা

কলা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে, কারণ কলাতে থাকে পটাশিয়াম যা দশ গুণ দ্রুততায় রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা কমিয়ে দেয়। তাই হাইপার টেনশনের রোগীদের প্রতিদিন ১ থেকে ২ টি কলা খাওয়া উচিত।

গোলমরিচ

যাদের স্বল্প মাত্রার রক্তচাপ ওঠা নামার সমস্যা আছে তারা গোলমরিচ খেলে উপকৃত হবে। গোলমরিচ খেলে হৃদপিন্ডের রক্তনালী প্রসারিত হয় যার ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে।

পেঁয়াজ

পেঁয়াজে কুয়েরসেটিন নামক একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা রক্তচাপ দ্রুত কমাতে পারে। এছাড়াও এতে রয়েছে সালফার যা সহজেই রক্তচাপ বৃদ্ধিতে বাধা দেয়।

মধু

মধুতে রয়েছে অলিগোস্যাকারাইড নামের এক ধরণের কার্বোহাইড্রেট। এটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে রক্তনালীকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যামাইনো এসিড, যা সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রসুন

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে রসুন উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সহায়ক। কাঁচা এবং রান্না করা দুই অবস্থাতেই রসুন রক্তের কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। এতে হৃদপিন্ড থাকে বাড়তি চাপমুক্ত।

লেবু

লেবুতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তনালীকে টক্সিনমুক্ত বা পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও এতে থাকা ভিটামিন সি ক্ষতিকর উপাদান থেকে হৃদপিন্ডকে রক্ষা করে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ইনফো কুইজ

ইনফো কুইজের সকল প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ পেপটিক আলসার ডিজিজ্ থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালোভাবে পড়ে সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে ইনফো স্বাস্থ্য সাময়িকীর সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডটি আগামী ৩০ আগষ্ট ২০১৮ ইং তারিখের মধ্যে আপনার নিকটস্থ আমাদের প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবেন।

১. পেপটিক আলসার ডিজিজের জন্য দায়ী জীবাণুর নাম কী?

- ক) *Mycobacterium tuberculosis*
- খ) *Helicobacter pylori*
- গ) *Group-A beta heamolytic streptococcus*
- ঘ) *Mycobacterium leprae*

২. নিচের কোন অংশে পেপটিক আলসার ডিজিজ্ হয়?

- ক) খাদ্যনালী বা ইসোফেগাসের উপরের প্রান্ত
- খ) পাকস্থলী বা স্টোমাক
- গ) ক্ষুদ্রান্ত্র বা ডিওডেনামের শেষ অংশ
- ঘ) উপরের সবগুলো

৩. নিচের কোন লক্ষণটি পেপটিক আলসার ডিজিজের ক্ষেত্রে দেখা যায় না?

- ক) বুক ও পেটের উপরের অংশে ব্যথা ও জ্বালাপোড়া
- খ) বমি বমি ভাব ও বমি
- গ) অরুচি ও ক্ষুধামন্দা
- ঘ) মাথাব্যথা

৪. পেপটিক আলসার ডিজিজের সাথে নিচের কোন রোগের লক্ষণের মিল পাওয়া যায়?

- ক) কোলেসিস্টাইটিস
- খ) স্ট্রোক
- গ) হেপাটাইটিস
- ঘ) অ্যাজমা

৫. পেপটিক আলসার ডিজিজের জন্য নিচের কোন এসিড দায়ী?

- ক) সালফিউরিক এসিড
- খ) হাইড্রোক্লোরিক এসিড
- গ) নাইট্রিক এসিড
- ঘ) ফসফরিক এসিড

৬. পেপটিক আলসার ডিজিজের জন্য কোন পরীক্ষাটি করা হয়?

- ক) ইসিজি
- খ) বুকের এক্স-রে
- গ) এন্ডোস্কোপি
- ঘ) ইউরিন টেস্ট

৭. পেপটিক আলসার ডিজিজের চিকিৎসায় নিচের কোন ওষুধ দেয়া হয়?

- ক) প্যারাসিটামল
- খ) এমলোডিপিন
- গ) এসপিরিন
- ঘ) ওমিপ্রাজল

৮. ট্রিপল থেরাপি চিকিৎসায় নিচের কোন ওষুধ দেয়া হয় না?

- ক) ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন
- খ) সেফিক্সিম
- গ) মেট্রোনিডাজোল
- ঘ) ওমিপ্রাজল

৯. পেপটিক আলসার ডিজিজ্ হলে নিচের কোন জটিলতা দেখা দেয়?

- ক) এপিন্ডিসাইটিস
- খ) মায়োকারডিয়াল ইনফারক্শন
- গ) আমাশয়
- ঘ) পারফোরেশন

১০. পেপটিক আলসার ডিজিজ্ প্রতিরোধে নিচের কোনটি করা উচিত?

- ক) চা, কফি, কোমল পানীয় ইত্যাদি গ্রহণ করা
- খ) বেশী মসলাযুক্ত খাবার গ্রহণ করা
- গ) ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করা
- ঘ) ধূমপান ও মদ্যপান হতে বিরত থাকা

ADVANCING
POSSIBILITIES

প্রকাশনায়
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট, এসিআই লিমিটেড
৮৯ গুলশান এভিনিউ, সিম্পলট্রি আনারকলি, ঢাকা-১২১২